ছোটগল্প

শারদ অর্ঘ্য

অন্তরিন

দেবপ্রিয়া সরকার

–হ্যালো তিস্তা? আমি উত্তরা বলছি।

–হ্যাঁ উত্তরাদি বলো।

–কী রে কিছু ভাবলি? করছিস তো কাজটা?

–ভাবছি, এখনও কিছু ডিসিশন নিতে পারিনি গো। তুমি তো সিদ্ধার্থকে জানো। বুঝতে পারছি না ও ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবে। আর আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বা কী বলবে।

–উফ আর কতদিন? দশটা বছর কাটিয়ে ফেললি অন্যের কথা মতো চলে, এবার তো নিজের ইচ্ছের দাম দে। শোন আজ বিকেল চারটেতে বিভাসদা আমার বাড়িতে আসবেন। আজই কাস্টিং ফাইনাল করা হবে। যদি তুই তোর মনকে রাজি করাতে পারিস তা হলে চলে আসিস। নিজেকে এবার মুক্ত কর এই বন্দিদশা থেকে।

আস্তে করে 'হুম'বলে ফোনটা কেটে দিল তিস্তা। দোতলার ব্যালকনিতে রাখা ইজি চেয়ারটায় গিয়ে বসল সে। আজকে বড্ড মনে পড়চে বোলপুরের কথা, শান্তিনিকেতনের কথা, ভুবনডাঙার সেই খোলা আকাশটার কথা।

ছোট থেকে বোলপুরে মানুষ হয়েছে তিস্তা। তার বাবা শক্তিপদ সান্যাল ছিলেন বল্লভপুরের প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক। ভুবনডাঙাতে ছিল তাদের ছোট্ট বাগানঘেরা বাড়ি। শক্তিপদ চিরকালই প্রকৃতিপ্রেমিক। তাই নদীর নামে দুই মেয়ের নাম রেখেছিলেন, রূপসা আর তিস্তা।

শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের ছাত্রী এই দুই বোন ছিল নদীর মতোই উচ্ছল। সকালবেলা সাইকেল নিয়ে চলে যেত স্কুলে। সেখানকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাচ–আবৃত্তি–নাটক সব কিছুতেই ছিল তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। বড় হয়ে যখন তিস্তা বিদ্যাভবনে ওঠে সেখানে পরিচয় হয় উত্তরার সঙ্গে।

উত্তরা জলপাইগুড়ির মেয়ে। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। সেখানে পড়া শেষ করে আবার ফিরে আসে নিজের শহরে। এখন সে একটা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে রয়েছে তার নিবিড় যোগাযোগ।

নাট্যঘরে একবার ইতিহাস আর ফিলোজফি ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা যৌথ নাটক পরিবেশন করেছিল। তখন থেকেই দু'বছরের সিনিয়র উত্তরার সঙ্গে তিস্তার বন্ধুত্ব। শান্তিনিকেতে ছাড়ার পরও রয়ে গিয়েছিল সম্পর্ক।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে তিস্তাকে ভাবনায় ডুবে থাকতে দেখে কমলিকা বললেন,

–কী হয়েছে তিস্তা, এই অসময়ে এভাবে বসে আছ?

শাশুড়িমার গলা শুনে সংবিৎ ফিরল তিস্তার। বলল,

–না মা তেমন কিছু নয়।

কমলিকা চিন্তিত স্বরে বললেন,

–তুমি মুখে কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারি, বাবানকে নিয়ে তুমি একটুও সুখি নও। ছেলেটা যে এতটা বদলে যাবে আমি ভাবতেও পারিনি। কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?

–আপনার ছেলে সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যায়। ফেরে মাঝরাতে, ওভারড্রাঙ্ক হয়ে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কি তার আছে?

–মনখারাপ কোরো না তিস্তা। ধৈর্য রাখো। ইচ্ছে হলে ক'টা দিন না হয় বোলপুর থেকে ঘুরে এসো।

–না মা এখন গেলে বুল্পুর পড়াশোনার ক্ষতি হবে। তা ছাড়া বাবা–মা দু'জনেরই বয়স হয়েছে। দিদি তার নাচের স্কুল, সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। আমি গেলেই নানা প্রশ্ন করবে। শুধু শুধু সবাইকে টেনশন দিয়ে কী লাভ?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল তিস্তা। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

–আমি যদি নিজেকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখি তা হলে আপনাদের কি অসুবিধে হবে?

–না না তা কেন? কী করতে চাও, চাকরি?

–নাহ। ক'দিন ধরে উত্তরাদি বলছে কলকাতার নাট্যকার বিভাস বসু এখানকার কলাকুশলীদের নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে চান। শান্তিনিকেতনে একবার উনি আমার অভিনয় দেখেছেন। উত্তরাদি আর বিভাসদা চাইছেন আমি ওই নাটকে অভিনয় করি। কিন্তু আপনার ছেলে বা আপনারা বিষয়টা কীভাবে নেবেন সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন কমলিকা। তারপর বললেন,

–একসময় আমারও খুব গান গাওয়ার শখ ছিল জান? কিন্তু বনেদি বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই সেই ইচ্ছের সমাধি হয়েছে। তোমার বেলায় এমনটা হোক আমি চাই না। তোমার শ্বশুরমশাই অসুখে শয্যাশায়ী এ সব নিয়ে ভাবার মতো অবস্থা তাঁর আর নেই। আর বাবান কী বলবে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনও দরকার কি তোমার আছে? নিজের শখ–সাধ মেটানোর সময় সে ক'বার তোমার কথা ভাবে? তবুও তোমাকে কিছু বললে আমি থাকব তোমার পাশে। যাও মা তোমার ইচ্ছে পূরণ করো।

তিস্তা একটু যেন অবাক হল। দশ বছর ধরে দেখা মানুষটাকে আজকে আবার নতুন করে চিনল সে।

উত্তরার ড্রয়িং রুমে বসে বিভাস বসু তিস্তাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন স্ক্রিপ্ট। ও. হেনরির গল্প 'দ্য লাস্ট লিফ'এর অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে নাটকের প্লট। ঘরবন্দি, অবসাদগ্রস্ত, মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা এক শিল্পীকে আর একজন শিল্পীর বাঁচিয়ে রাখার গল্প। তিস্তা থাকবে অসুস্থ জুনিয়র আর্টিস্টের ভূমিকায়। এই পর্যন্ত শুনে সে জানতে চাইল,

–সিনিয়র আর্টিস্টের রোলটা কে প্লে করবেন?

বিভাস একমুখ হাসি নিয়ে বললেন,

–অনির্বাণ। হোয়াট আ মারভেলাস অ্যাক্টর হি ইজ। তুমি দেখ তিস্তা তোমাদের যুগলবন্দি কীভাবে মুগ্ধ করবে সকলকে।

বুল্পু ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। এখন রাত বারোটা। তিস্তা বসে আছে সিদ্ধার্থের অপেক্ষায়। আজ তার মাথায় শুধু ঘুরছে নাটকের স্ক্রিপ্ট। কোনও এক অদেখা অনির্বাণের কাল্পনিক ছবি তার চোখের সামনে। মনের মাঝে দৃশ্যায়িত হচ্ছে একের পর এক সিন। আচমকা গাড়ির হর্নের শব্দে চমকে গেল সে। সদর দরজার সামনে দেখতে পেল নেশায় চুর হয়ে থাকা সিদ্ধার্থকে। ঘরে ঢুকেই নিজের ভারী শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।

এই মানুষটাকেই একসময় নিজের মন–প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল তিস্তা। দিদি–জামাইবাবুর সঙ্গে প্রথমবার দার্জিলিং বেড়াতে এসে পরিচয় হয়েছিল সিদ্ধার্থর সঙ্গে। তখন সে সবেমাত্র বাবার চা–বাগানের ব্যবসা দেখাশোনার ভার নিয়েছে। টি–প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিল দার্জিলিংয়ে। একদিন দেখা হয়ে যায় গ্লেনারিজে। ধীরে ধীরে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, শেষে প্রেম। তাদের সম্পর্ক বিয়ের পরিণতি পেতে বেশি সময় লাগেনি। সুদর্শন, বিত্তশালী সিদ্ধার্থ ছিল একেবারে মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলার। আর তিস্তা সুন্দরী, শিক্ষিতা, নম্র স্বভাবের মেয়ে। বিয়ে করে বোলপুরের তিস্তা এসে পড়ে তিস্তা পাড়ের এই জলশহরে। এখানে তার বন্ধু বলতে একমাত্র উত্তরা।

চা–বাগানের ব্যবসা একটু ঝিমিয়ে পড়তেই সিদ্ধার্থ নেমে পড়েছিল কনস্ট্রাকশনের ব্যবসায়। এখন সারা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে আছে তার কারবার। বিজনেস যত বাড়ছে তত দূরে চলে যাচ্ছে সিদ্ধার্থ। একই ঘরে, একই খাটে পাশাপাশি শুয়ে থাকা দু'টো মানুষ। কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছেরা উঁকি দেয় তিস্তার মনে। ভাবে হয়তো সিদ্ধার্থ আবার আগের মতো কাছে আসবে, ভরিয়ে দেবে আদরে আদরে। কিন্তু না, তাদের মাঝে তৈরি হয়ে গেছে একটা অদৃশ্য দেওয়াল। যে দেওয়ালকে ভেঙে ফেলার ক্ষমতা তিস্তার একার নেই।

রিহার্সাল হলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন অনির্বাণ। খোলা জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের নরম রোদের ছটা এসে লাগছে তাঁর গায়ে। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোঁকড়ানো চুল, শ্যামলা গায়ের রং, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, প্রায় ছ' ফুটের মতো লম্বা মানুষটা মন দিয়ে বুঝে নিচ্ছেন নিজের পার্ট। শান্তিনিকেতনে থাকা কালে এমন পুরুষদের তারা বলত, টল–ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। একটা হালকা হাসি খেলে গেল তিস্তার চোখে–মুখে।

স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলছিল তাদের রিহার্সাল। অনির্বাণকে প্রথমদিন যতটা গম্ভীর মনে হয়েছিল, আদপে তিনি তা নন। একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রাণবন্ত সত্তাটা। টানা দশ বছর পর অভিনয়ের জগতে ফিরে এসে প্রথম প্রথম একটু হোঁচট খাচ্ছিল তিস্তা। কিন্তু বিভাস আর অনির্বাণের সহযোগিতায় সব বাধা কাটিয়ে উঠছিল সে। তার অভিনয়ে মুগ্ধ হচ্ছিল সবাই। আর তিস্তা মুগ্ধ হচ্ছিল অনির্বাণকে দেখে। কী অসম্ভব ডেডিকেশন কাজের প্রতি। অদ্ভুত সুন্দর এক্সপ্রেশন, চোখের ভাষা। রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে তিস্তার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছিলেন জীবনের টুকরো টুকরো পাওয়া–না পাওয়াগুলো।

–নাটকের প্রতি প্যাশন আমি আমার বাবার

অনির্বাণকে প্রথমদিন যতটা গম্ভীর মনে হয়েছিল, আদপে তিনি তা নন। একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রাণবন্ত সত্তাটা। টানা দশ বছর পর অভিনয়ের জগতে ফিরে এসে প্রথম প্রথম একটু হোঁচট খাচ্ছিল তিস্তা। কিন্তু বিভাস আর অনির্বাণের সহযোগিতায় সব বাধা কাটিয়ে উঠছিল সে।